দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 15 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫

'শিক্ষা' থেকে কালো মেঘ কেটে যাক

মোনায়েম সরকার

প্রধানমন্ত্রী দেশের শিক্ষার জন্য অনেক কিছুই করছেন, তাকে এসব কৃতিত্বের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই, সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে এটাও প্রত্যাশা করব– শিশুদের বইয়ের বোঝা ও পরীক্ষাভীতি দূর করুন, অভিভাবকদের কোচিং ডাকাতি থেকে বাঁচান, শিক্ষার দুর্নীতি কঠোর হাতে দমন করুন, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার আলোয় পাঠক্রম তৈরি হোক

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে আমি একটি লেখা লিখেছিলাম। দেশে ও বিদেশের বেশ কয়েকটি পত্রিকায়, এমনকি দেশের ও বিদেশের অনলাইন পত্রিকায় সেই লেখাটি গুরুত্বের সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল। সেই লেখাটি পড়ে অনেকেই আমাকে ফোন করেছেন, কেউ কেউ ই-মেইলেও তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আবার যেন এ রকম একটি সময়োপযোগী লেখালেখি সেই অনুরোধও করেছেন কেউ কেউ। পাঠকের অনুরোধ রাখতেই আজকের এই লেখা। এই লেখায় তত্ত্ব আর তথ্য যা-ই থাকুক– বাস্তবতাই হবে মূল কথা। আমি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সব সময়ই আগ্রহী। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড বলেই যে শিক্ষা নিয়ে আমার এত কৌতূহল বিষয়টি তা নয়। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড তখনই হয় যখন সেই শিক্ষা পরিপূর্ণ শুদ্ধ শিক্ষা হয়। আবোল-তাবোল শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়, জাতিকে দুর্বল করে তোলে। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক কেউ-ই সন্তুষ্ট নন। কেন সন্তুষ্ট নন? এমন প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আগে এই তিন শ্রেণির মানুষের সাক্ষাৎকার বা মতামত শোনা দরকার। তার পর বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা।

আমাদের ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রয়োজনে নানা পেশার নানা বয়সের মানুষ প্রতিদিনই যাতায়াত করেন, তবে যেহেতু এটা গবেষণাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান শিক্ষিত লোকের আনাগোনাটাই তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি। দেশ-বিদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই আমাদের ফাউন্ডেশনে এসেছেন, এখনো ফাউন্ডেশনের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে নতুন নতুন পণ্ডিত-গবেষকরা আসছেন। নতুন-পুরনো যেখানে এক পঙ্‌ক্তিতে বসার সুযোগ পায় সেখানেই সৃষ্টি হয় নতুন তত্ত্ব, নতুন চিন্তা, নতুন উদ্ভাবন।

এ কথা আজ আর অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার চেয়ে কোচিং সেন্টারের শিক্ষা পদ্ধতি জনপ্রিয় ও পাস করানোর ক্ষেত্রে শতভাগ সাফল্যের দাবিদার। বিভিন্ন কোচিং সেন্টার কর্তৃক যে ব্যানার, লিফলেট ছাপানো হয় এবং সেখানে যেসব পরিসংখ্যান দেওয়া থাকে তা দেখে মনে হচ্ছে, এ দেশের অষ্টম বা দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ভার সরকারের নেওয়া উচিত, বাকিটা কোচিং সেন্টার পড়াবে– সরকার শুধু নির্দিষ্ট কিছু লোকবল নিয়োগ করে স্তরভিত্তিক পরীক্ষা নেবে এবং পাস করাবে। এতে করে জাতীয় রাজস্ব যেমন সাশ্রয় হবে, লাঘব হবে অভিভাবকদের দ্বিমুখী দৌড়ঝাঁপ (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টার) ও অর্থনৈতিক চাপ।

অবাক হতে হয়, যখন শুনি দশম শ্রেণির একটি ছাত্রের কোচিং ফি মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা। আরও অবাক হই, যখন শুনি উপজেলার অনার্স কলেজগুলোয় অনার্সের একজন শিক্ষার্থীও ক্লাসে উপস্থিত নেই। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি এ প্রশ্ন আজ অতীব গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করার সময় এসেছে। এগুলো দ্রুত মীমাংসা করা দরকার। জিইয়ে রাখলেই সামনে বিপদের সম্ভাবনা।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম আর দুর্নীতির ঘাতক ব্যাধি বাসা বেঁধেছে। অনিয়ম ও দুর্নীতির কিছু নমুনা দিলেই তা বোঝা যাবে। যেমন– ১. কিছুদিন আগে পাঠ্যপুস্তকে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা কাঁচি-ছুরি চালিয়ে পাঠ্যপুস্তক জামায়াতিকরণ করল, তার কোনো কূলকিনারাই করা গেল না। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এতবড় অনিয়ম হয়ে গেল– ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ উপড়ে ফেলে রোপণ করা হলো সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষ তা নিয়ে মন্ত্রণালয় মোটেই চিন্তিত হলো না। এটা অশনিসংকেত বলেই আমার ধারণা। ২. সরকারের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও কোচিং-গাইড বই বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। যদি এই ধারাই চলতে থাকে, তবে কোটি কোটি বই ছেপে বিতরণ করে কী লাভ? শুধু বাহাবার জন্য বই ছেপে টাকা খরচ করার কোনো দরকার আছে কি? ৩. যারা চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী তারা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানে বহাল তবিয়তে আছে। মাঝে মাঝে দু-একজনকে ধরে আইওয়াশ করা হলেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। ৪. কোনো কোনো সরকারি শিক্ষক বা শিক্ষা কর্মকর্তা যে চেয়ারে একবার বসেন, সেখান থেকে তিনি উঠতেই চান না। যেন চেয়ারখানা তার পৈতৃক সম্পত্তি। ৫. শিক্ষার মতো পবিত্র বিষয় আজ ঘুষের কলঙ্কে কলঙ্কিত– এটা নৈমিত্তিক ঘটনা। ওইদিন এক শিক্ষক আমাকে দুঃখ করেই বলছিলেন, জীবনে এক টাকাও ঘুষ খেলাম না, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ঘুষ দিতে হয়। না হলে এলপি ঠিকমতো যায় না, বেতন চালু হয় না, ফিক্সেশন পেপার সই হয় না– সমস্যার শেষ নেই।

সরকার যদি সত্যিই সত্যিই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মঙ্গল চায় তা হলে তার উচিত হবে একমুখী প্রগতিশীল শিক্ষার বাস্তবায়ন। সরকারের চেয়ে দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানই বড় নয়– একটি সুন্দর শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার জন্য সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। কিন্তু আন্তরিকভাবে সরকার সেই ইচ্ছাটুকু পোষণ করবে কিনা সেটাই বড় ব্যাপার। বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে যে বাজেট বরাদ্দ রাখে তা আফগানিস্তান (৪.৬%), ভুটান (৫.৬%), নেপাল (৪.১%), ভারত (৩.৯%), পাকিস্তানের (২.৫%) জিডিপির চেয়ে অনেক কম। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা খাতে জিডিপির ৬% বরাদ্দ হওয়ার কথা, সেখানে বাংলাদেশে ব্যয় জিডিপির ২.২%। এটা শুধু কমই নয়, অত্যন্ত কম। সন্তানই যদি সুসন্তান না হয়, তাহলে সম্পদ দিয়ে কী হবে। দেশের প্রতিটি সন্তানই রাষ্ট্রের সম্পদ– এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ যাতে ভবিষ্যতে কাজে লাগে সে বিষয়ে আরও বেশি যত্নবান হওয়া দরকার।

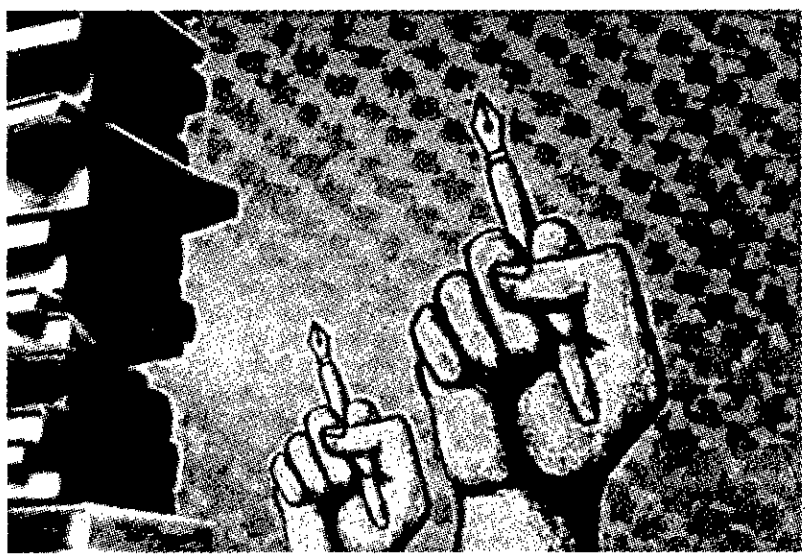

বাংলাদেশের মতো পিইসি (প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট), জেএসসি (জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) পরীক্ষা পৃথিবীর আর কোথাও এত ঘটা করে হয় কিনা সন্দেহ। যে দুটো পরীক্ষার সনদ শিক্ষার্থীদের জীবনে কোনোই কাজে আসবে না তা নিয়ে কেন সরকারের এত মাতামাতি? কেন এত কোচিং বাণিজ্যের সুযোগ? কেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের এত অনর্থক পণ্ডশ্রম? বাংলাদেশে এখনো প্রাইমারি স্কুলে শিশু শিক্ষার পরিবেশ সন্তোষজনক নয়। শত শত স্কুল চলে একজন বা দুজন শিক্ষক দিয়ে, অসংখ্য স্কুলে প্রধান শিক্ষকই নেই। স্কুল ঘর নেই কিন্তু শিক্ষার্থী আছে এমন স্কুলের সংখ্যাও একেবারে কম নেই। মাঝে মাঝেই পত্রিকায় গৃহহীন স্কুলের খবর আসে– যা সত্যিই বেদনাদায়ক।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী 'শিক্ষা খাতে ব্যয় নয়, বিনিয়োগে বিশ্বাসী'– এটা যদি সত্যি হয়, তা হলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তবে কি শিক্ষাব্যবস্থা ঘুরে দাঁড়াতে পারছে? পরিসংখ্যান যাই বলুক, সরেজমিন গেলে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত আমরা যেই চিত্র দেখব তা মোটেই আশাব্যঞ্জক কিছু নয়। শিক্ষার যে একেবারেই কোনো পরিবর্তন হয়নি, এটা বলা ঠিক হবে না– তবে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয়েছে শিক্ষা খাতে আর তাতে ফল যা ফলেছে এটাকে পর্বতের মূসিক প্রসব বলে ধরাই যুক্তিযুক্ত। বার্ষিক বই উৎসব, উপবৃত্তি প্রদান, ডিজিটাল কন্টেন্টের ওপর গুরুত্বারোপ, ভবন নির্মাণের মতো কিছু বাহ্যিক আড়ম্বরকে সূচক ধরে যদি বাংলাদেশের শিক্ষার মান নির্ণয় করা হয়, তা হলে তা হবে তাসের ঘর নির্মাণ করার মতো, যা যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে।

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার শক্তিশালী ভিত হচ্ছে তার পাঠ্যক্রম। পাঠ্যক্রম যদি গোঁজামিল দিয়ে করা হয়, সেখানেই যদি শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলা হয়, তা হলে যত রকম আয়োজনই হোক না কেন, সেই শিক্ষা ব্যর্থ শিক্ষায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। বাংলাদেশের পাঠ্যক্রম অত্যন্ত নিম্নমানের বলেই পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এই নিম্নমানের শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের আগামী প্রজন্ম কী শিখবে জানি না, তবে দেশ তলিয়ে যাবে অন্ধকারে, বাংলাদেশের স্কুল শিক্ষাকে এখন অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কারণ হলো– একজন স্কুলের শিক্ষার্থী ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর নৈতিকতার জায়গাটি একই। স্কুলে পড়া শিক্ষার্থীটির উচিত ছিল সেক্যুলার হওয়া, অসাম্প্রদায়িক হওয়া, প্রগতিশীল হওয়া কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে এসবের ধারে-কাছেও নেই। যদি স্কুল শিক্ষার ফল আর মাদ্রাসা শিক্ষার ফল শেষ পর্যন্ত একই হয়, যদি দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় কোচিং সেন্টার– তাহলে শিক্ষার মান বাড়ছে এটা কীভাবে বলা যায়?

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর উপস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক। এদের শুধু পরীক্ষার সময়ই দেখা যায়– সারা বছর কোনোই খোঁজ থাকে না। বাংলাদেশে অনার্স বা ডিগ্রিতে পাসের হার এতটাই আশাতীত মাঝে মাঝে শিক্ষকরাও অবাক হন। একদিনও ভর্তি হওয়ার পর কলেজে আসেনি এমন শিক্ষার্থীর প্রথম শ্রেণি পাওয়ার রেকর্ড আছে। এটাও কি চিন্তা করা সম্ভব? বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ঘুষের পরিবর্তে ডোনেশন প্রথা চালু হয়েছে। এসব জায়গায় শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও ডোনেশন লাগে, শিক্ষক নিয়োগ দিলেও ডোনেশন লাগে– এগুলো নিশ্চয়ই উপযুক্ত শিক্ষার জন্য বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। এ বিষয়ে সরকারের নজরদারি কঠোর হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী দেশের শিক্ষার জন্য অনেক কিছুই করছেন, তাকে এসব কৃতিত্বের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই, সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে এটাও প্রত্যাশা করব– শিশুদের বইয়ের বোঝা ও পরীক্ষাভীতি দূর করুন, অভিভাবকদের কোচিং ডাকাতি থেকে বাঁচান, শিক্ষার দুর্নীতি কঠোর হাতে দমন করুন, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার আলোয় পাঠক্রম তৈরি হোক।

❑ মোনায়েম সরকার : কলাম লেখক